International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.115-122
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.115-122

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন (১৯৪৭-২০২৩)

সৌরভ অধিকারী

অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পৃথ্বীশ চন্দ্র বিশ্বাস কন্যা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

West Bengal has evolved in almost every aspect since the post-independence period till today. Political changes have affected it a lot. So-called politics is involved in almost everything and of course it reflects the society. In the 75 years since independence, various aspects of West Bengal's society and culture have undergone a renaissance. The traditional traditions of Bengal are almost disappearing today. At present, a new culture has been born in Bengal with the help of the internet. Compared to before, the clothes, customs, food habits have changed. And in this new culture, the people of the present society are mixed. Of course, there are pros and cons. Bengal's traditional Yatrapala, Baul Song etc. are on the way to extinction today, its place has been taken by various apps of current smartphones. In the light of the discussion of West Bengal, it can be said that the old society of rural Bengal has now diversified, a mixed culture has been created by the amalgamation of the old and the new.

Keywords: Durga Puja, Baul Song, Joint Family, Internet, Youth Culture.

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে বিপুল পরিমাণ বৈচিত্র দেখা গিয়েছে এবং তার সঙ্গে এটির কালে কালে বিবর্তন ঘটেছে। কিছু বছর পূর্বেও সমাজে মানুষের মধ্যে যে মূল্যবোধ ছিল তার কোথাও একটু ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রথমেই আসবো পশ্চিমবঙ্গের সমাজের প্রসঙ্গে। যে কোন আলোচনা করতে গেলে তাতে কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ অবশ্যই উঠে আসবে। স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে অর্থাৎ ঠিক যখন থেকে নির্বাচন শুরু হয়েছে তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের শাসন কায়েম হয়েছে। অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ঠিক কিছুটা সেই ভাবে চালিত হয়েছে। আমার আলোচনার বিষয় হলো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন। যদিও জেলা তবু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আভাস এখান থেকে কিছুটা পাওয়া যাবে, এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা আমি কাজের ক্ষেত্রে অথবা ভ্রমণের সূত্রে ঘুরেছি। দেখেছি সেখানকার মানুষজন জেনেছি সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। হুগলি জেলার মধ্যে অবস্থিত সেই প্রাচীন প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য বাড়তে থাকে নবম দশম শতাব্দী থেকে।[১] পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটি গ্রামীন এলাকা অন্যটি শহর, উদাহরণস্বরূপ হুগলি জেলা যদি বলা হয় তাহলে এটিকে আমি দুটি ভাগে ভাগ করব একটি গ্রামীন হুগলি আরেকটি শহুরে হুগলি। শহুরে হুগলি বলতে ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, চন্দননগরকে বলা যেতে পারে, ব্যান্ডেল একটি সুপ্রসিদ্ধ জায়গা। স্বাধীনতার পরে ব্যান্ডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৬৪ সালে নির্মিত হলে ইহা কলকাতা ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের বিদ্যুৎ সংকটের অবসান করতে সক্ষম হয়।[২] সত্তর-আশির দশক বা কিছু পরে পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গে একটি অন্যতম চাকরি ছিল ডানলপ ফ্যাক্টরির চাকরি। যেটি হুগলি জেলার বান্ডেল এ অবস্থিত। যারা এখানে চাকরি করতেন তাদের সমাজে উঁচু মান ছিল। পরবর্তীকালে এই ফ্যাক্টরি উঠেছে এবং বর্তমানে ওই স্থান ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ শিল্প কারখানার বর্তমানে বেশ অবনতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমাজকে যদি আমরা দেখি আমরা দেখব এই সমাজ কয়েকটি ভিত্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং বহুকাল ধরে এই ভিত্তিগুলির পরিবর্তন হয়েছে।

সারা ভারতের ক্ষুদ্র অংশ হলো পশ্চিমবঙ্গ তাই সারা ভারতের যে বৈচিত্র দেখা যায় তার ক্ষুদ্র সংস্করণ অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে। সমাজের ভিত্তিগুলি হল জাতি, পেশা, বর্ণ, শিক্ষা, খাদ্য, পোষাক ইত্যাদি। জাতিগত সমস্যা আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত যার ব্যতিক্রম নয় পশ্চিমবঙ্গ। যেটি স্বাধীনতার প্রথম দিকে থাকলেও তা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার কথা কারো অজানা নয়। কলকাতায় সমস্ত কিছু একাকার হয়ে গেলও বাংলার গ্রামগুলিতে তা কিন্তু প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল তাই এটি একটি বড় প্রাচীর তখন আর এখনের মধ্যে। বাংলার গ্রামগুলি যদি দেখা যায় দেখা যাবে যে গ্রামের যে পারাগুলি তা তাদের জাতের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছিল উদাহরণস্বরূপ বামুনপাড়া বাউড়িপাড়া তেলিপাড়া ইত্যাদি। খুব বেশি আগে নয় বাংলার সমাজের উনিশ শতকের ইতিহাস যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে কিভাবে মানুষের জীবনে পেশা কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল এবং তা থেকে সমাজের বিভিন্ন দিকের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে একটি বড় সমস্যা ছিলো উদ্বাস্তু সমস্যা যা সমকালীন সরকারের কাছে একটি বিশাল চাপের কারণ হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যেহেতু বিভিন্ন কারখানা গুলি বন্ধ হয়ে যায় তাই কৃষির উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মানুষ,কৃষি ছাড়া মানুষের নির্ভরযোগ্য পেশাগুলি হলো সোনার গয়না তৈরী, কাঠমিস্ত্রি, বই এর ব্যবসা, মুদিখানা, মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি অর্থাৎ বেশিরভাগটাই গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। সমাজের গতিশীলতার জন্য ছিল চাকরি তবে বড় বড় ব্যাবসাদার রাও আছে। বর্তমান সময়ে গ্রামগুলিতে ক্লাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি গ্রামে অনেকগুলি করে পূজা বিশেষত দূর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, কালীপূজা দেখা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে গ্রামগুলিতে বা দুটো একটি গ্রাম নিয়ে একটি পূজা হতো এবং সেখানে গ্রামের অন্যান্যরা জমায়েত হতেন।কথাতেই আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাংলা মাসের প্রথম দিন যেটিকে আমরা পয়লা বৈশাখ বলি, বাঙালি সমাজে এই দিনটির আয়োজন বিশেষভাবে পরিবর্তন হয়েছে। নতুন খাতার ব্যাপার টা এক প্রকার প্রায় ছন্দ হারিয়েছে। ১৯৮০-৯০ বা ২০০০ সালের একদম প্রথম দিকেও এই দিনটিতে সকালে রাস্তায় বেরোলে চারিদিক থেকে ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ কানে আসতো এবং ধুনোর গন্ধ পাওয়া যেত, প্রায় প্রতিটি দোকানেই দু'পাশের কলা গাছটার নিচে ঘট এবং দরজায় মালা ঝোলানো অর্থাৎ দোকানে দোকানে গণেশ, লক্ষ্মী পূজা এই যে চিত্রটা বর্তমানে একদমই হারিয়ে গেছে। বর্তমানে মানুষ একদম আধুনিকতাই মেতে উঠেছে।

পশ্চিমবাংলা তথা বাংলার সমাজে একটি অন্যতম ধারা হলো গান।এই গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাটিয়ালি, সারিগান ইত্যাদি এছাড়াও বাউল গান এবং গ্রাম বাংলার কীর্তন। বাউল সংগীত তথা বাউল গানের করুন রস আবার কখনো কখনো হাসি, ঠাট্টা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বাউল গানগুলি বাংলার মানুষের জীবন উদ্ভাসিত করতো। স্বাধীনতার সময় কখনো কখনো এইসব গান বিপ্লবীদের মুখেও শোনা যেত। স্বাধীনতার পরেও এই গান শোনা যেত। বিংশ শতকের আশি বা নব্বইয়ের দশকে গ্রাম বাংলার পরিবেশ যদি দেখা হয় দেখা যাবে গ্রামগুলিতে আসর বসতো বাউল গানের, একটি গ্রামের কোন মন্দিরে বা ফাঁকা জায়গাগুলোতে এই গান গাওয়া হত। টিভি রেডিও তেও এই গান শোনা যেত। সেই সময় গ্রামবাংলায় বাউল গানের এত জনপ্রিয়তার অনেক কারণ ছিল, বেশিরভাগ বাউল গান গুলি ছিল মানুষের জীবনকেন্দ্রিক। মানুষের জীবনে প্রত্যহ যেসব ঘটে যাওয়া ঘটনা তাই ছিলো বাউল গানের বিষয়। হুগলি, নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগনা, মালদা,বর্ধমান এইসব জেলা গুলি বাউল গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বাউল গান গুলির ভাষায় মানুষ একপ্রকার শান্তি খুঁজে পেতো কিন্তু এক বিংশ শতকে সেই বাউল গান যেন বাংলার মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন অনেক মানুষ তথা বাউল গানের দল আছে মাঝে মাঝে তাদেরকে দিয়ে গান করানো হয় অর্থাৎ বর্তমানে এটি একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। তবে বাংলায় বিশেষ কিছু জায়গা যেমন বোলপুর শান্তিনিকেতনের সোনাঝুড়ি তে যদি যাওয়া যায় সেখানে কিন্তু এখনো বাউল গান শোনা যায়। পশ্চিমবাংলার সমাজের আরেকটি অন্যতম ধারা হলো কীর্তন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বারা উদযাপিত শুধুমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় নয় সমাজের নানা স্তরের মানুষের কীর্তন অর্থাৎ যাকে গ্রাম বাংলার ভাষায় হরিনাম বলা হয় এটির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হিন্দুদের একটি পবিত্র উৎসব হলো এই হরিনাম আর এই হরিনামের সঙ্গে যুক্ত পালা গান। হরিনামের ধারা বাংলার বিভিন্ন সময় বিবর্তিত হয়েছে হরিনাম বহুকাল থেকেই আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই হরিনাম গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে বিলিয়ে ছিলেন, এছাড়াও ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন।[৩] এই হরিনাম বর্তমানে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। হুগলি এবং বর্ধমান জেলার ভিত্তিতে যদি বলি এখানকার গ্রামগুলি হরিনাম সংকীর্তন বহুল ভাবে প্রচলিত হয়েছে। যেটি বেশ কয়েক দশক আগে গ্রামের একটি হরিসভায় হরিনাম হতো সেটি বর্তমানে বাড়ি বাড়ি হচ্ছে। আসলে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বেশিরভাগ মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটেছে তবে কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি একেবারেই হারিয়ে যায়নি। এরপর আসবো বাংলা সমাজের আরেকটি অন্যতম ধারা যাত্রা বা থিয়েটার। স্বাধীনতার বহু আগে থেকে আমাদের সমাজে যাত্রাপালা হত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় আমরা তার উল্লেখ পেয়েছি। স্বাধীনতার সময় ইংরেজদের অবিচার গুলিকে কিভাবে যাত্রাপালার মাধ্যমে মহান বিপ্লবীরা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেন তার ইতিহাস আমরা মোটামুটি সবাই জানি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও গ্রাম বাংলার সমাজে যাত্রাপালা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কলকাতার বড় বড় নাট্যদল তো ছিলই যা এখনো আছে এবং এর সঙ্গে বাংলার গ্রামগুলিতে গ্রামের লোকেরা মিলে বিভিন্ন যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত করত। বিভিন্ন যাত্রা দল গড়ে উঠেছিল। আশি-নব্বই এর দশকে বর্তমান সময়ের মতো মোবাইল তো ছিলই না টিভি ও না থাকার মতন। তাহলে সেই সময় মানুষের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিলো যাত্রাপালা। যেকোনো উৎসব বা পুজোতে যাত্রাগুলি অনুষ্ঠিত হতো। একটা বড় গ্রামেতেই অনেক কটি করে যাত্রার দল থাকতো। বয়স্ক লোকজনের মুখে সেই সময়কার কিছু বর্ণনা পাওয়া গেছে, যাত্রার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই চলতো মহরা। অবশ্যই কোন একটা ক্লাবকে সংগঠিত করে দলগুলি গড়ে উঠত, শুধুমাত্র সেই গ্রামের দল সেই গ্রামেতেই যাত্রা করছে

এমনটা না নয় তারা অনেক দূরের গ্রামে তেও যাত্রা অনুষ্ঠিত করছে এবং একটি দলের সঙ্গে অন্য দলের প্রতিযোগিতা হত যে কে কত বেশি রাত্রি যাত্রা করছে। যাত্রার বিষয় ছিল সামাজিক বিভিন্ন কাহিনী অথবা দেব-দেবী, পুরাণ বা কোন মানুষের আত্মজীবনী।এই গুলির ধারা বিশেষ একটা পরিবর্তন হয় নি এই শতক গুলিতে। পশ্চিমবঙ্গের জনজাতির বর্ণনা অনুসারে এগুলি সমাজে টিকে ছিলো, এই প্রসঙ্গে জেলার গেজেট গুলি পরিদর্শনীয়।[৪] এই যাত্রাপালার ইতিহাসের বিবর্তন নিয়ে অনেক লেখালেখি আছে যা পড়লে এই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। তবে বর্তমান সময় এই যাত্রা ততটা দেখা যায় না বললেই ভালো হয়। কলকাতার বড় বড় নাট্য কোম্পানিগুলি এখনো আছে তবে তার মহিমা আগের মতো নেই। বাংলার গ্রামগুলিতে এই নাট্যদল গুলি একদম হারিয়ে গেছে বললে ভুল হবে কিছু পরিমাণ এখনো টিকে আছে উদাহরণস্বরূপ হুগলি জেলার ধনিয়াখালি, দশঘরা এই অঞ্চলগুলির নাট্য দলগুলি এখনো আছে এবং তারা যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত করে। তবে বলা যেতে পারে বিশেষত মোবাইল ফোন অথবা মানুষের কর্মব্যস্ততায় এই যাত্রাপালার চাকচিক্য একদমই হারিয়ে গেছে।

স্বাধীনতার একেবারে প্রথমে পরিবার গুলির মধ্যে বেশিরভাগ ছিল জয়েন্ট ফ্যামিলি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই জয়েন্ট ফ্যামিলিগুলি আর টিকে থাকে নি, অর্থনৈতিক,সামাজিক কারণে ভেঙে গেছে। বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের যে ধারণাটা ভেঙ্গে যায়। বিভিন্ন কারণে এই পরিবার গুলি ভেঙে যায়, প্রধান কারণ অন্তঃকলহ এছাড়াও শিক্ষা, চাকরি তাদের কারণে পরিবার গুলি ভেঙে যায় এখান থেকে সমাজের বিপুল পরিবর্তন ঘটে। যারা লেখাপড়া শিখছে তারা স্বাভাবিকভাবেই কৃষি বা ব্যবসা ছেড়ে চাকরি দিকে আসতে চাইছে এর ফলে একটি শিক্ষিত গ্রুপে সৃষ্টি হয়েছে।এর ফলে সমাজের দুটি দিকের সৃষ্টি হয়েছে একদল যারা পুরনো রীতি নিয়ম আচার বিচার ইত্যাদিকে রাখছে আর এক দল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রাচীন বিশ্বাসগুলিকে মানতে চাইছেনা, এখন এই পুরনো নতুন দ্বন্দ্ব টা রয়ে গেছে সমাজের মধ্যে। এই ৭৫ বছরে বদলেছে বাংলার মানুষের খাবার পোশাক পরিচ্ছদের অভ্যাস। বাংলার মানুষের বিশেষত পুরুষদের ধুতি-পাঞ্জাবি এবং মহিলাদের শাড়ির বাজার নিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার দেশগুলির পোশাক। তবে এর যথেষ্ট কারণ আছে এখন নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে বিশেষত বাইরের কাজে অফিস আদালতের কাজে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং রাস্তায় চলাফেরার সুবিধার্থে পোশাকের পরিবর্তন ঘটবে। স্বাধীনতার সময় সারা দেশের ইতিহাস যদি দেখা যায় দেখা যাবে সেই সময় বেশিরভাগ মানুষের সব থেকে বড় প্রতিকূলতা ছিল দুবেলা খাওয়ার আর বাকি জিনিসগুলো ছিল বিলাসবহুল যার ব্যতিক্রম ছিল না আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। সমকালীন মানুষদের কাছে এই অভাব পূরণের চেষ্টা ছিল সবার প্রথম কাজ সুতরাং দুবেলা খাওয়াটাই যেখানে কষ্টকর সেখানে অন্যান্য জিনিসের চাহিদা যে থাকবে না তাই বলা বাহুল্য। সত্তর -আশির দশকে পুরুষদের পরনের মধ্যে ছিল ধুতি। তবে মানুষের দরিদ্র তা এতটাই চরম পর্যায়ে ছিল যে কখনো কখনো একটি ধুতিকে তারা দুই খন্ড করে পড়তো। বর্তমান সময়ের মতো পরিবার গুলি এত ছোট ছিল না এখন পিতা-মাতার সন্তান একটি বা দুটি সেই সময় সন্তানের সংখ্যা পাঁচ -ছয়টি আবার সাত -আটটিরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুতরাং একজন মানুষের পক্ষে এতগুলো মানুষের দায়িত্ব সম্ভব হতো না যার কারণে শিক্ষাটাও সবার কাছে সমানভাবে যেত না এবং তাদের কাজের খোঁজে খুব ছোট বয়স থেকে যোগ দিতে হতো, এইসব কারণের জন্য অনেক সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। এই জিনিসগুলো এখন একেবারেই পরিবর্তন হয়েছে। ছোট পরিবার হওয়ায় সন্তানকে একটি ভালো শিক্ষা দিতে আগ্রহী। স্বাধীনতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতি নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে যার ব্যতিক্রম নয় আমাদের রাজ্য।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি পেয়েছে হুগলী জেলার সেইরূপ একটি বিবরনের কথা সুধীর কুমার মিত্রের বইতে উল্লেখ আছে।[৫]

একটি সভ্যতা কে যখন বিশ্লেষণ করি তখন আমরা সেই সভ্যতার সংস্কৃতির কথা বারবার বলি। একটি মানুষের সঙ্গে আরেকটি মানুষের পরিচয় করতে হলে বা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলে সেই মানুষটির আচার ব্যবহারের দিকে আগে নজর পড়ে। নব্বই এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত যুবকদের সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়ে আসছে। একটি সমাজের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যুব সমাজ। পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন যুব সমাজ সমকালীন যুব সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। একদম আশি -নব্বই এর দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুব সমাজের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যুব সমাজের সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কোন একটি দিক শুধুমাত্র আলোচনা করলে চলবে না। বর্তমান যুবসমাজ বিভিন্ন শাখায় ভেঙে গেছে এবং তাদের সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা উঠে আসবে তা হলো পোশাক। একটি সভ্যতা বা সমাজের সংস্কৃতি বলতে প্রথমে পোশাকের দিকে নজর আসে। একটা সময় অনেক আগে যখন বাংলা রোল মডেল ছিলেন ঠাকুর বাড়ির লোকেরা পোশাক-আশাক। সেই সময় যাত্রা বা থিয়েটারের নায়ক-নায়িকারা কি পোশাক পড়ছে সে বিষয়ে নজর দেওয়া হতো। যদি আশির দশক দেখা হয় বা তারো পরে সেখানে পুরুষের প্রধান পোশাক ছিল ধুতি এবং পাঞ্জাবী, তবে অনেকে ফতুয়া পড়তেন আর মহিলারা অবশ্যই শাড়ি পড়তেন তা আগেই আলোচনা করেছি। তবে এই সময় থেকে পোশাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন ঘটছে। কিভাবে ঘটছে এখানেই তা আলোচনা করব। হঠাৎ যে পরিবর্তন এ কথা বলা যায় না, তবে ধুতি থেকে আস্তে আস্তে প্যান্ট-শার্টের দিকে এলো। মহিলাদের কথা যদি বলা হয় তাদের শাড়ির মধ্যে বৈচিত্রতা দেখা যায়। এবার একদম বর্তমান পোশাক পরিচ্ছদের কথা বলা যাক বর্তমান সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে যুব সমাজের যে পোশাক তার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথমে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথায় আসা যাক ছেলেরা একপ্রকার জিন্স এবং টি শার্টকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। মেয়েরা জিন্সকে অবশ্যই প্রাধান্য দিচ্ছে তবে কুর্তিটার ব্যাপক প্রচলন আছে। এগুলি ছাড়াও মেয়েদের জন্য আরো ভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান শতককে আগের থেকে পৃথক করছে ইন্টারনেটের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন এবং এর থেকে কয়েকটা নতুন দিকের আবির্ভাব ঘটেছে উদাহরণ স্বরূপ বলে যেতে পারে অনলাইন শপিং। বর্তমান সমাজএই অনলাইন শপিং -এ বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান সময়ে কোন দোকানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা একটি পুরনো প্রথা হয়ে উঠেছে, এটার অনেক সুবিধা আছে তবে অসুবিধা অনেক আছে। যে প্রোডাক্টটি দেখানো হয় অনেক সময় সেটি পাওয়া যায় না আবার কোয়ালিটির ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা যায়। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে কোন অনুষ্ঠানে ট্রাডিশনাল পোশাকগুলোই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বিয়েতে বা সরস্বতী পূজায় দেখা যাচ্ছে ছেলেরা পাঞ্জাবিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং মেয়েরা শাড়িকে। আসলে বর্তমান সমাজে বেশিরভাগটা ওয়েস্টার্ন পোশাক আশাকে দিকে বেশি ঝুঁকে গেছে। আমরা পোশাক পাশ্চাত্যের আদলে পরলেও আমাদের মন কিন্তু এখনো কতটা কুসংস্কার মুক্ত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। বর্তমান সমাজ সংস্কৃতি একটি বড় অঙ্গ স্মার্টফোনের ব্যবহার। প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ের কাছে একটি করে দামি স্মার্টফোন দেখা যাচ্ছে। আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে আগের শতক গুলি থেকে বর্তমান শতককে আলাদা করেছে ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেটের অঙ্গ হিসাবে জড়িত স্মার্টফোন। তবে অনেক সময় এর ব্যবহারের থেকে অপব্যবহার বেশি

করছে। বর্তমান সমাজের বেশির ভাগ মানুষ দেখা যাচ্ছে তারা স্মার্টফোনে অফুরন্ত সময় ব্যয় করছে। স্মার্টফোনের বিভিন্ন অ্যাপস তারা ব্যবহার করছে অবশ্যই এর শিক্ষামূলক অনেক দিক আছে তবে তারা অনলাইন গেম বা সোশ্যাল মিডিয়া তেই সীমাবদ্ধ। যুব সমাজের ক্ষেত্রে সন্ধ্যাবেলার পর তারা ছুটির দিনগুলিতে পাড়ার মোড়ে বা বাড়িতে গ্রুপ করে তার অনলাইন গেম খেলছে। অনলাইন গেম চলাকালীন তাদের বিরক্ত করলে ফোনটা নিয়ে নিলে তাদের ব্যবহারে হিংস্রতা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পুরনো সংস্কৃতির জায়গা গুলিতে নতুন সংস্কৃতি পুরনো যেসব জিনিসপত্র সেগুলো তো বর্তমানে আছেই এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জিনিস যুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান যুব সমাজ মেতে উঠেছে সেটি হল রিলস তৈরি করাতে ছেলে এবং মেয়ে অংশগ্রহণ করছে। যদি অনেক ক্ষেত্রে এটি আয়ের একটি পথ দেখায় তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম। শহর থেকে গ্রামে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে রিলস এর পেছনে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করছে।

এরপর আলোচনা প্রসঙ্গে যেটা বলা যেতে পারে সেটা হলো ফেসবুক বর্তমান সময়ে ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের ছবি আপলোড করাটা একটা ট্রেন্ড হয়েছে। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যাচ্ছে যে ছবি শেয়ার করে তাতে প্রচুর লাইক পড়লে তাদের ভালো লাগছে। শুধুমাত্র মেয়েরাই নয়, ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য তবে তার সংখ্যাটা কম। শুধুমাত্র ছবি নয় যেটা আগেও বললাম রিলস তৈরি করা বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে প্রচলিত। তারা সুন্দর ছবির জন্য মোবাইলের পিছনে প্রচুর টাকা ব্যয় করছে এর থেকে বর্তমানে আরেকটি যে সংস্কৃতি বল যেতে পারে সেটি হল ফটোশুট সংস্কৃতি। বেশিরভাগ কলেজ ছাত্র ছাত্রীরা এ ব্যাপারটিকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করছে।এখান থেকে তাদের আরেকটি নতুন চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে সেটি সুন্দর বাইক। কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে তাদের বাসস্থান থেকে কিছুটা বাইরে গিয়ে তারা ছবি সুট করছে। এটাকে তারা একটা নতুন দায়িত্বের মতো পালন করছে তবে সবার ক্ষেত্রে এটি দেখা যাচ্ছে এমনটা কিন্তু নয়। ফটোশুট এর আগে একদিন গিয়ে তারা জায়গাটিকে পরিদর্শন করছে ঠিক আগে যেমন দূরে কোথাও গিয়ে পিকনিক করলে সেই পিকনিক স্পট দেখা হতো, জায়গা ঠিক করে রীতিমত ভালো ক্যামেরা এবং ভালো পোশাক পরে তারা সেই স্থানে যাচ্ছে তারপর ছবি তুলে সেগুলিকে সোশ্যাল মিডিয়া তে আপলোড করছে। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে একটা ভালো ফোন বর্তমানে স্ট্যাটাস নির্ণয় করছে। এখন বর্তমান সময় পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপ পাওয়া যায় এতে বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয়। এই সুবিধা গুলি আগে ছিল না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এই টাকাটা তারা ফোনের পিছনে ব্যয় করছে। বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে যেটা দেখা যাচ্ছে তারা স্কলারশিপের টাকা দিয়ে ফোন কেনার কথা ভাবছে। বর্তমানে একটি নতুন সংস্কৃতি হলো, বার্থডে সেলিব্রেশন বা জন্মদিন পালন এটি আগেও ছিল তবে এখন এর চাকচিক্য বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে এটা একটা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে তবে এই ব্যাপারটা সবথেকে সহজ করছে তাহলে ফেসবুক। ফেসবুকে যে জন্ম তারিখ থাকে তাই কারোনে জন্মদিনে জানাটা এখন একদমই সহজ। স্কুল থেকে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারটি চরমভাবে পালন করছে। জন্মদিনে কেক কাটার মাধ্যমে সেলিব্রেশন এবং বন্ধুকে উপহার দেওয়া। তারপর কোন রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া । আসলে আগের দশক গুলোতে এগুলি একদমই ছিল না এবং একদম প্রথমে বলাই হয়েছে আলোচনা প্রসঙ্গে যে তখন দুবেলা খাওয়াটাই ছিল সবথেকে বড় অসুবিধা। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে আগের থেকে মানুষ এখন অনেক উন্নত হয়েছে অবশ্যই সেটি অর্থনৈতিকভাবে। এরপর যেটা আসবো সেটা হল শিক্ষক দিবস পালন। আমাদের শিক্ষকের

প্রতি শ্রদ্ধা প্রথম থেকেই। আমাদের দেশে শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্ক মধুর। তবে আগের শিক্ষক দিবস পালন এবং এখনকার শিক্ষক দিবস পালনের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বর্তমানে শিক্ষক দিবস পালন একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ থেকে গোটা মাসটা এটি চলে। আসলে উৎসব এই জন্য এখানে এখন প্রচুর টাকা ব্যায় হয়। শিক্ষক দিবস বলতে যেটা বোঝা যায় তা হলো শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন চিরাচরিত ভাবে এই দিন শিক্ষককে প্রণাম এবং সামর্থ্য মতো একটা পেন শিক্ষককে দেওয়া হতো।কিন্তু বর্তমান যুব সমাজে বিশেষত ছাত্র সমাজে টিচার্স ডে কে বিশেষভাবে পালন করা হচ্ছে। প্রাইভেট টিউশনিতে এগুলিতে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিকল্পনা করে তারা চাঁদা তুলছে প্রতি বছরে শিক্ষককে উপহার দেওয়ার জন্য তারা তাদের সামর্থ র থেকে বেশি টাকা ব্যয় করছে যেটা অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করছে। যেসব ছাত্রের বাবা-মা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এরপর খাওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা যাক।বাংলার জল এবং ফল বহু যুগ থেকেই খুব সুন্দর।[৬] কিন্তু বর্তমানে বাঙালির খাওয়ার পাতে মেনুর পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাস থাকবে। তবে বর্তমান সময়ে গোটা বাংলার সমাজে খাবারের চরম পরিবর্তন ঘটেছে। কয়েক দশক আগে ও তা পরিলক্ষিত হতো না। বাংলার আলোচনা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটি আরো ভালো বোঝা যাবে। বাঙালি খাবারের বদলে সেখানে পাশ্চাত্যর খাবার স্থান নিয়েছে।বাঙালির রান্নার ঘরে পাশ্চাত্যের খাবার চলে এসেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান যদি দেখা হয় খাবার-দাবারের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বার্গার, পিকজা এই সমস্ত খাবারগুলি মানুষজন বেশি পছন্দ করছেন। যার কারণে এসব খাবারের দোকানের সংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আরেকটি খাবার খুবই প্রচলিত তা হলো বিরিয়ানি। আসলে বিরিয়ানি খাওয়াটা এখন একটি ট্রেডিশন হয়ে উঠেছে। বিরিয়ানি খাওয়াতর থেকেও খেয়ে যখন বলছে আজ বিরিয়ানি খেলাম এ ব্যাপারটি মানুষের কাছে বেশি আনন্দ দায়ক। এ কারণে রাস্তার মোড়ে একটা করে বিরিয়ানির দোকান দেখা যাচ্ছে। তবে এইসব খাবার প্রচুর খাওয়া একদমই শরীরের পক্ষে ভালো নয়। এসব খাবার শরীরের ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতি করছে, ফলত শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে তত জনসংখ্যা বাড়ছে। এখন একটা ভালো জীবন অতিবাহিত করাটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুব সমাজ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। ছেলে এবং মেয়ে উভয় শুধু ধরনটা আলাদা। ছাত্র -ছাত্রীদের প্রথমে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেটি হল তাদের ক্যারিয়ার। একটি জীবন কে সুরক্ষিত করতে হলে একটি ভালো ভবিষ্যৎ দরকার। শুধুমাত্র নিজের জীবন সুরক্ষিত নয় তার সঙ্গে জড়িয়েছে তার পরিবার। পড়াশোনা শেষ করছে কিন্তু এখন মিনিমাম ইনকামে সোর্স পাচ্ছে না আর সেখান থেকেই সমস্যার শুরু হচ্ছে।যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনটি ভাগে ভাগ করি। তাহলে বলতে পারব স্বাধীনতার পূর্ববর্তী, স্বাধীনতার পরবর্তী এবং বর্তমান সময় অর্থাৎ করোনার পরবর্তী সময়, তাহলে দেখা যাবে করোনার কারণে লকডাউন শুরু হয় এবং এই লকডাউনের ফলে বহু কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরনো জিনিসগুলি বিপন্নের পথে সেই স্থান দখল করছে নতুননেরা।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ বিনয়, "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৪৯৬
২. মিত্র সুধীরকুমার, "হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ", দ্বিতীয় খন্ড, মিত্রাণী পাব্লিকেশন, কলকাতা ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৬৯৪
৩. ঘোষ বিনয়, "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,পুস্তক প্রকাশক", কলকাতা ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৬৯৪
৪. O'malley, L.S.S And Chakravarti Monmohan, "Bengal District Gazetteers; Hooghly:" The Bengal Secretariat Book Depot. Calcutta 1912, Pp 1-10
৫. মিত্র সুধীরকুমার, "হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ", প্রথম খন্ড, মিত্রাণী পাব্লিকেশন, কলকাতা ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৩৯২
৬. Gupta Das Chandra Tamonash, "Aspects Of Bengali Society From Old Bengali Literature", University Of Calcutta, Calcutta 1935, Pp 304

সহায়কগ্রন্থ:

১. চৌধুরী নারায়ন, "বাংলার সংস্কৃতি", বেঙ্গল পাবলিসার ,কলকাতা ১৯৫৬
২. চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী, "বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি", সেতু প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৫
৩. ঘোষ গৌরাঙ্গপ্রসাদ, "যাত্রা শিল্পের ইতিহাস", ঘোষ লাইবেরি কলকাতা ১৯৯৬
৪. সান্যাল হিতেশ রঞ্জন, "বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৮৯
৫. মুখোপাধ্যায় অমিতাভ, "উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি", বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৭১
৬. Bhawal Poulami, "Social And Cultural History Of A Bengal District, Jalpaiguri (1869-1994)", University Of North Bengal 2016

ওয়েবসাইট:

১. https://www.bajajfinserv.in/advantages-and-disadvantages-for-online-shopping
২. https://webandcrafts.com/blog/social-media-advantages-and-disadvantages
৩. https://aaftonline.com/blog/benefits-of-photography/